মন্‌সবদারী-প্রথা ঃ আকবরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল মন্‌সবদারী-প্রথার প্রচলন। আকবর শের শাহের মতো জায়গির-প্রথার বিরোধী ছিলেন। মোগল রাজত্বকালে সামরিক ও বে-সামরিক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত মন্‌সবদারী-প্রথা। পারস্যদেশে এই প্রথা বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল এবং আকবর তা অনুকরণ করেছিলেন মাত্র। মোগল প্রশাসনিক সংগঠন ছিল মূলত সামরিক ধাঁচের এবং এর প্রধান ভিত্তি ছিল সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। আকবরের পূর্বে মোগল রাজকর্মচারীদের সংগঠিত করার বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। হুমায়ুন তাঁর কর্মচারী তথা সমগ্র জনগণকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন, যথা—'অহল-ই-দৌলত' (বিত্তশালীরা), 'অহল-ই-সাদাৎ' (সাধু-সন্ত ও পণ্ডিতরা) এবং 'অহল-ই-মুরাদ' (সাধারণ মানুষ)। এইভাবে সমগ্র সামরিক ও

---

* *সতীশচন্দ্র—মোগল দরবারে দল ও রাজনীতি—পৃঃ ২৩।*

Scanned by CamScanner

বে-সামরিক কর্মচারীদের 'অহল-ই-দৌলত' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।* কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম আকবরই মন্‌সবদারী-প্রথা প্রবর্তন করে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠিত করতে প্রয়াসী হন। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সুলতানি আমলে সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের 'দেওয়ান-ই-আর্জ' বিভাগ থেকে বেতন দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। বারণির গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দিনের সভাকবিরা 'দেওয়ান-ই-আর্জ' থেকে বেতন পেতেন। কিন্তু সামরিক বিভাগ থেকে বেতন পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যে আলাউদ্দিনের যুদ্ধবিগ্রহে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন এমন কোনো নজির নেই।**

সরকারি কর্মচারীদের সংগঠিত করা ছাড়াও, মন্‌সবদারী-প্রথা প্রবর্তন করার মূলে আরও একটি কারণ ছিল—প্রচলিত জায়গির-প্রথার কুফল। প্রাক্-আকবর যুগে উচ্চপদস্থ সামরিক ও বে-সামরিক রাজকর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গির দেওয়া হত। কর্মচারী ও অভিজাতরা যুদ্ধের সময় সম্রাটকে সেনা জোগান দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে সাহায্য করার বিনিময়ে জায়গির ভোগ করতেন। কিন্তু কালক্রমে জায়গির-প্রথা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অথচ দুর্নীতিগ্রস্ত জায়গিরদারদের ওপর সম্রাটকে নির্ভর করতে হত। এই কারণে আলাউদ্দিন খাল্‌জী নগদ বেতনে সম্রাট-নিয়ন্ত্রিত এক কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং অধিকাংশ জায়গির বাজেয়াপ্ত করে নেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় জায়গির-প্রথা চালু হয়। যথেচ্ছ জায়গির বিতরণের ফলে খালিসাজমি ক্রমেই জায়গিরদারদের হাতে চলে যায়, ভূমি-রাজস্ব খাতে সরকারি আয় হ্রাস পায়। তাছাড়া সুলতানি আমলের শেষের দিকে জায়গির-প্রথা বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ায়, জায়গিরদাররা রাষ্ট্রের সেবা করার পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা লাভে প্রয়াসী হয় এবং রাষ্ট্রের সংহতি ও নিরাপত্তার পক্ষে তা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই সকল কারণে আকবর জায়গির-প্রথা যথাসম্ভব খর্ব করে সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন মন্‌সবদারী-প্রথা প্রবর্তনে প্রয়াসী হন।

'মন্‌সব' কথাটির অর্থ হল পদমর্যাদা। আরভিন্ (Irvine)-এর মতে এই প্রথার লক্ষ্য ছিল বেতন অনুযায়ী কর্মচারীদের পদমর্যাদা স্থির করা। ভারতে মোগলদের শাসনাধীনে 'মন্‌সব' কথাটির অর্থ হল দায়িত্ব বা কর্তব্য। কিন্তু মন্‌সবদারী-প্রথার সংগঠন ও প্রসারের ক্ষেত্রেই দুটি সমস্যা প্রথম থেকেই ছিল। প্রথমত, এই প্রথার অন্তর্গত সকল পদাধিকার ব্যক্তির ক্ষেত্রেই 'মন্‌সব' কথাটি ব্যবহৃত হত না। শুধুমাত্র উচ্চ পদাধিকারীদের ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করা হত যদিও প্রশাসনের সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তা ছিল প্রযোজ্য। কুরেশী (Qureshy)-র মতে দ্বিতীয় সমস্যা ছিল এই যে, সামরিক অর্থেই 'মন্‌সব' কথাটি ব্যাখ্যা করা হত, যদিও এই ব্যাখ্যা ছিল নেহাৎই অলীক বা প্রতীক মাত্র।† 'মন্‌সব' কথাটি ছিল অলীক—কারণ সকল কর্মচারীকে সামরিক পদমর্যাদা দেওয়া হলেও সকলের ক্ষেত্রে সামরিক দায়িত্ব পালন করা সদাসর্বদা বাধ্যতামূলক ছিল না।†† তথাপি একথা সত্য যে, মন্‌সবদারী-প্রথার আওতায় প্রতিটি কর্মচারিরই কিছু না কিছু সামরিক দায়-দায়িত্ব ছিল।

মন্‌সবদারী-প্রথার বিবর্তন

এ. জে. কাইজার-এর মতে আকবরই প্রথম মন্‌সবদারী-প্রথার প্রবর্তন করেন। তাঁর রাজত্বকালে অষ্টাদশ বছরে (১৫৭৩-৭৪ খ্রিঃ) এবং প্রথম থেকেই এই প্রথায় 'জাত' ও 'সওয়ার'—এই দুই পদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে মন্‌সবদারী-প্রথার বিবর্তনের কতকগুলি ক্রমপর্যায় দেখা যায়। শিরিণ মুসভি-র মতে আকবরের সিংহাসনের আরোহণের পূর্বে অথবা তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দশ বছরে রাজকর্মচারীদের বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট সামরিক

---

* *অনিরুদ্ধ রায়—Some aspects of Mughal Administration—পৃঃ ২০৯।*

** *ওই।*

† *কুরেশী—"The mansab was defined in military terms, though the military definition was only a myth or at best a symbol"—Administration of the Mughals—পৃঃ ৮৯।*

†† *অনিরুদ্ধ রায়—"It was a myth because all officers were given military ranks although no military obligation was a necessary for him.—উল্লিখিত গ্রন্থ—পৃঃ ২০৮।*

Scanned by CamScanner

দায়-দায়িত্ব ছিল না এবং কর্মচারীদের বেতন যথেচ্ছভাবে নির্ধারণ করা হত। দ্বিতীয়ত, একাদশ বছরে (১৫৬৬-৬৭ খ্রিঃ) আকবর রাজকর্মচারীদের ওপর কিছু নির্দিষ্ট সামরিক দায়িত্ব ন্যস্ত করতে প্রয়াসী হন এবং জায়গিরের রাজস্বের অনুপাতে কিছুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত মোতায়েনের জন্য বাধ্য করেন। তৃতীয়ত, অষ্টাদশ বছরে (১৫৭৩-৭৪ খ্রিঃ) মন্‌সবদারী-প্রথা প্রবর্তন করা হয় এবং একটিমাত্র সংখ্যাসূচক পদ ধার্য করা হয়। এই সংখ্যা অনুসারে অশ্ব ও অশ্বারোহী বা সওয়ার রাখা কর্মচারীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়। অবশ্য বাস্তবে সামান্য সংখ্যক কর্মচারীই এই দায়িত্ব পালন করতেন। এই কারণে আকবর তাঁর রাজত্বকালের চল্লিশতম বছরে (১৫৯৫-৯৬ খ্রিঃ) মন্‌সবদারদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে পদ অনুযায়ী তাদের সওয়ারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেন। এই সময় থেকেই 'সওয়ার' পদের গুরুত্ব দেখা দেয় এবং ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই মন্‌সবদারী-প্রথায় 'জাত' ও 'সওয়ার' এই দ্বৈতপদ সুনির্দিষ্ট হয়। এই দ্বৈতপদের ভিত্তির ওপর মন্‌সবদারদের পাওনাগণ্ডার হিসাব স্থির করা হত। 'জাত'-পদের দ্বারা মন্‌সবদারদের ব্যক্তিগত বেতনের পরিমাণ স্থির করা হত। 'সওয়ার'-পদের সংখ্যা দ্বারা সৈন্যসামন্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি পরিমাণ অর্থ তারা সরকারি কোষাগার থেকে পাবেন তা স্থির করা হত। মোরল্যান্ড (Moreland)-এর মতে সওয়ার-পদের প্রাপ্য একটি নির্দিষ্ট হারে স্থির করা হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এক জটিল হিসাবনিকাশের পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত হত।* 'সওয়ার'-পদ ছিল তিন ধরনের, যথা— 'ইয়াক-আস্‌পা' বা এক ঘোড়ার সওয়ারি, 'দু-আস্‌পা' বা দুই ঘোড়ার সওয়ারি ও 'শি-আস্‌পা' বা তিন ঘোড়ার সওয়ারি। স্বভাবতই এদের পাওনার মধ্যে তারতম্য ছিল।

মন্‌সবদারদের কেউ কেউ নগদে বেতন পেতেন এবং এজন্য এদের বলা হত 'মন্‌সবদার-ই-নগদি'। অন্যান্য মন্‌সবদারদের নির্দিষ্ট পরিমাণে জমি জায়গির হিসাবে দেওয়া হত যদিও এই জায়গিরের ওপর মন্‌সবদারদের ব্যক্তিগত স্বত্ত্ব স্বীকৃত হত না। এই ধরনের জায়গিরকে বলা হত 'তন্‌খাজায়গির'। এছাড়া মন্‌সবদার-পদে নিযুক্ত সামন্ত-নৃপতিরা বংশানুক্রমিকভাবে জায়গির ভোগ করতেন, যাকে বলা হত 'ওয়াতনজায়গির'। ওয়াতনজায়গিরের রাজস্ব সামন্ত-নৃপতি ও জমিদাররাই নির্ধারণ করতেন। এই ক্ষেত্রে মোগল সরকারের বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

সাধারণভাবে সম্রাট নিজেই মন্‌সবদার নিয়োগের সর্বময় কর্তা ছিলেন এবং সম্রাটের সামনে পদপ্রার্থীদের উপস্থিতি আবশ্যিক ছিল। পদপ্রার্থীদের সম্রাটের সামনে উপস্থিত করার দায়িত্ব ছিল 'মীর বক্‌সী'র। মন্‌সবদার নিয়োগের অপর পন্থা ছিল সুপারিশ অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী অভিজাত, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও মোগল রাজকুমারদের সুপারিশ অনুসারে অনেক সময় মন্‌সবদার নিয়োগ করা হত। মন্‌সবদারদের নিয়োগ সম্রাটের অনুমোদন পাওয়ার পর তা নথিবদ্ধ করার জন্য দেওয়ান, বক্‌সী ও সামরিক হিসাব রক্ষকদের কাছে পাঠানো হত। নিয়োগপত্রগুলি নথিবদ্ধ হবার পর সেগুলি পুনরায় দ্বিতীয়বার অনুমোদনের জন্য সম্রাটের কাছে উপস্থিত করা হত ও সম্রাট তা অনুমোদন করতেন। উজীরের সীলকরা নিয়োগপত্রগুলি ফরমান হিসাবে অনুমোদিত মন্‌সবদারের কাছে পাঠান হত।

মন্‌সবদার নিয়োগ প্রথা ঃ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

মন্‌সবদার-পদের প্রতিটি প্রার্থীর পক্ষে জামিন দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। মানুচি (Manucci)-র মতে সৈনিকদের পক্ষেও জামিন দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। সাধারণত মহাজনরাই জামিনদার হত।

মন্‌সবদাররা নির্দিষ্ট অশ্ব ও অশ্বারোহী মোতায়েন রাখতে বাধ্য হবেন এই প্রত্যাশায় আকবর 'জাত ও সওয়ার' পদের সৃষ্টি করেন। কিন্তু মন্‌সবদাররা এই নিয়ম মেনে চলতেন না। সুতরাং তা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আকবর দাঘ বা চিহ্নিতকরণ (branding) ও 'চেহ্‌রা' বা বিবরণাত্মক তালিকা (descriptive roll) প্রথা চালু করেন।

'দাঘ' ও 'চেহ্‌রা'

---

* *শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা—পৃঃ ১২।*

Scanned by CamScanner

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, চিহ্নিতকরণ (branding) রীতি আদৌ অভিনব ছিল না। আলাউদ্দিন খাল্‌জী ও শের শাহ্ এই রীতি অর্থাৎ অশ্বের ওপর চিহ্নিতকরণ ইতিপূর্বেই প্রয়োগ করেছিলেন। আকবর এই রীতি পুনঃপ্রবর্তন করেন মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই রীতি বহাল থাকে এবং সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালেই এই রীতির অবসান হয়।

মন্‌সবদারদের শ্রেণিবিভাগ

মন্‌সবদাররা তেত্রিশটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন এবং এই শ্রেণিবিভাগ সেনা সংখ্যার ভিত্তিতেই করা হত। সর্বনিম্ন মন্‌সবদারের অধীনে ১০ জন সেনা এবং সর্বোচ্চ মন্‌সবদারের অধীনে পাঁচ হাজার সেনা থাকত। দশ-হাজারী, আট-হাজারী ও সাত-হাজারী মন্‌সব সাধারণত রাজকুমারদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকত।

পাঁচ শত 'জাত'-এর নিম্ন পদাধিকারকে বলা হত 'মন্‌সবদার'; পাঁচশো থেকে দুহাজার পাঁচশোর নিম্ন পদাধিকারকে বলা হত 'আমীর' এবং এর উর্ধ্বতন পদাধিকারকে বলা হত 'আমীর-ই-উম্‌দী'। কিন্তু এই তিন শ্রেণির পদাধিকারদের সকলকেই সাধারণভাবে 'মন্‌সবদার' বলা হত। মন্‌সবদারদের এই শ্রেণি বিভাগের কঠোরতা ছিল না। যেকেউ যোগ্যতা ও সম্রাটের অনুগ্রহে নিম্ন পদ-মর্যাদা থেকে উচ্চ পদ-মর্যাদায় উন্নীত হতে পারত। এইভাবে ব্যক্তিগত যোগ্যতার ওপর পদোন্নতি নির্ভরশীল ছিল।

মন্‌সবদারদের যুদ্ধের সময় সম্রাটের সঙ্গে সসৈন্যে যোগদান করতে হত। সামরিক কর্তব্য ভিন্ন বে-সামরিক কর্তব্যপালনেও তাঁরা বাধ্য থাকতেন। মন্‌সবদারী পদমর্যাদা ব্যক্তিগত ও সম্রাটের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তা প্রদত্ত হত না।

বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে মন্‌সবদারী-প্রথা গড়ে ওঠে এবং এক বিশেষ প্রশাসনিক সংস্থার রূপ পরিগ্রহ করে। যখনই কোনো বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠী প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠত, তখনই তাদের নেতাদের উচ্চ মন্‌সব দিয়ে মোগল প্রশাসনের মধ্যে সম্পৃক্ত করা হত। বিভিন্ন ধরনের মানুষদের রাজপদে নিয়োগ করার ফলে মোগল মন্‌সবদারদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়, যেমন—তুরানি, ইরানি, আফগান, শেখজাদা বা ভারতীয় মুসলমান, রাজপুত, দক্ষিণী, মারাঠী ও অন্যান্য হিন্দু। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আকবর বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতেন যে তাঁকে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণির ওপর নির্ভর করতে না হয়।

১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের পুত্র ও আত্মীয়ব্যতীত মন্‌সবদারদের জাতিগত বিন্যাস পরিবেশিত হল—

	মোট সংখ্যা	হিন্দু	ইরানি
৫০০০ ও তদূর্ধ্ব	৮	১	৪
৩০০০ - ৪০০০	১৩	৩	৫
১০০০ - ২৫০০	৩৭	৬	৬
৫০০ - ৯০০	৬৩	১২	১২
২০০ - ৪৫০	১৫৯	২৪	৪৫
	২৮০	৪৬	৭২

মোগল মন্‌সবদারদের প্রচুর বেতন দেওয়া হত। একশো 'জাত' পদাধিকারী মন্‌সবদারদের বেতন ছিল মাসিক ৫০০ টাকা; এক হাজার পদাধিকারী মন্‌সবদারের বেতন ছিল ৪৪০০ টাকা এবং পাঁচ হাজারী মন্‌সবদারের বেতন ছিল মাসিক ৩০,০০০ টাকা।

'দাখিলী' ও 'আহদী'

মন্‌সবদার ভিন্ন 'দাখিলী' (Dakhili) এবং 'আহদী' (Ahadi) নামে অন্য দুধরনের সেনার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দাখিলী' সেনাবাহিনীর পরিচালনার ভার মন্‌সবদারদের ওপর ন্যস্ত থাকত, তবে তাঁরা রাজকোষ থেকে বেতন পেতেন। 'আহদী'দের পরিচালনার ভার আমীরদের হস্তে ন্যস্ত থাকত এবং তাঁরা উচ্চহারে বেতন পেতেন।

Scanned by CamScanner

মন্‌সবদার ও তাদের সেনাবাহিনী ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। এই দিক দিয়ে পূর্বতন সামরিক-প্রথার তুলনায় অধিকতর উন্নত। আবুল ফজল লিখেছেন যে, জাতিগত সম্পর্ক সেনাবাহিনীর প্রতিটি মানুষকে নেতার প্রতি অনুগত রাখত এবং মন্‌সবদারী-প্রথার ফলে সেনা নিয়োগ করার বিশাল দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ না করে মোগল সম্রাট এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সমর্থ হলেন। উপরন্তু মধ্য-এশিয়ার ভাগ্যান্বেষী মোঙ্গল ও উজবেক এবং বিক্ষুব্ধ আফগানদের বিরুদ্ধে রাজপুত মন্‌সবদাররা সমভার রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। এছাড়া একমাত্র সম্রাটের প্রতি মন্‌সবদারদের আনুগত্য থাকায় মন্‌সবদারী-প্রথা ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে উঠেছিল যা সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। একথা সত্য যে, মন্‌সবদারদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রেখে আকবর সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষেত্রে এই প্রথার কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আকবরের আমলে মোগলবাহিনীর দক্ষতা ও শৃঙ্খলার কথা বিদেশি পর্যটকরা উল্লেখ করেছেন। সামরিক সংস্থার সংগঠন, সরঞ্জাম ও শৃঙ্খলার প্রতি আকবরের সজাগ দৃষ্টি ছিল। মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকায় তিনি দক্ষতা, সাহসিকতা ও আনুগত্যের ভিত্তির ওপর মন্‌সবদার নিয়োগ করতেন। তিনি মন্‌সবদারী-প্রথাকে এমন দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন যে সারাজীবন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অপরাজেয় ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর আমলে এই প্রথার চরম সাফল্যের পরিচয়।

মন্‌সবদারী-প্রথা ত্রুটিমুক্ত ছিল না এবং মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে এই ত্রুটিগুলি নেহাৎ অকিঞ্চিৎকরও ছিল না।* কিছুকাল চালু থাকার পর সামরিক যন্ত্র হিসাবে মন্‌সবদারী-প্রথার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রশাসনিক সকল বিভাগকে একক কেন্দ্রীয় যন্ত্রে পরিণত করার ফলে মন্‌সবদারী-প্রথা বা সংগঠনের দক্ষতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। দীর্ঘসূত্রী আমলাতান্ত্রিক রীতি-নীতি সামরিক বিভাগে প্রবেশ করার ফলে এর দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রীতা মন্‌সবদারী-প্রথা তথা সামরিক শক্তিকে যথেষ্ট জটিল করে ফেলে। সেনার জন্য মোগল প্রশাসকরা মন্‌সবদারদের ওপরই অধিক নির্ভরশীল থাকতেন এবং এই বিশাল সংস্থার সুপরিচালন নির্ভর করত সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সম্রাটদের ব্যক্তিগত দক্ষতার অভাব্ ঘটলে মন্‌সবদারী-প্রথা প্রায় ভেঙে পড়ে। প্রতিটি মন্‌সবদার সেনা পরিচালনায় দক্ষ—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের (theologians) সমরনায়ক নিযুক্ত করে সম্রাটরা মারাত্মক ভুল করেছিলেন এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। রণাঙ্গনে মন্‌সবদারদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও ঈর্ষা প্রভৃতি কারণে অনেক ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর পরিচালন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত। এই প্রসঙ্গে কারনালের রণক্ষেত্রে মন্‌সবদারদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণাম উল্লেখ করা যায়।** এই প্রথার অপর অন্যতম ত্রুটি ছিল দুর্নীতির প্রতি আকর্ষণ। ঐতিহাসিক আরভিন্ (Irvine) লিখেছেন যে, মন্‌সবদাররা তাঁদের নিজ নিজ সৈনিকের সংখ্যার কারচুপি করতেন বলে মোগলবাহিনীর ভিত্তি বরাবরই দুর্বল ছিল। মন্‌সবদাররা একে অপরকে সেনা ধার দিয়ে পরস্পরের নির্দিষ্ট সংখ্যার ঘাটতি পূরণ করতেন এবং অনেক সময় কর্মহীন বেকারদের সামরিক পোশাকে সজ্জিত করে সুদক্ষ সেনা হিসাবে ব্যবহার করতেন। এই সকল দুর্নীতি দূর করার জন্য মন্‌সবদারদের সেনাদের দেহের বর্ণনামূলক দলিল (Descriptive Roll) ও দাগ্ (অশ্বের ওপর দাগ)-প্রথার প্রচলন করা হয়। তথাপি মন্‌সবদারী-প্রথার দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

মন্‌সবদারী-প্রথার মূল্যায়ন

অবশ্য প্রথমদিকে মন্‌সবদারী-প্রথা মোগল রাজতন্ত্র তথা রাষ্ট্রশক্তিকে শক্তিশালী করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এই প্রথার ফলে মোগল-সাম্রাজ্যে ইওরোপের সামন্ততন্ত্রের মতো জাত-ভিত্তিক সামন্ততন্ত্র গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। কারণ পদোন্নতি ও পুরস্কারের জন্য প্রতিটি মন্‌সবদার সম্রাটের অনুগ্রহের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকতেন।

---

* কুরেশী—*Administration of the Mughals*—পৃঃ ১১২।

** অনিরুদ্ধ রায়—উল্লিখিত গ্রন্থ—পৃঃ ২৩৪।

Scanned by CamScanner

আকবর প্রতিটি সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহীদের দ্বিগুণ অশ্ব পোষণ করার নিয়ম চালু করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে সেনাবাহিনীর ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি ঘোড়সওয়ারদের ভরণ-পোষণের খাতে অর্থ হ্রাস করে ২০০ টাকা করেন। এছাড়া জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পরিবর্তন হল 'দু-আস্‌পা' (দুই ঘোড়ার সওয়ারি) ও 'শি-আস্‌পা' (তিন ঘোড়ার সওয়ারি) প্রথার প্রবর্তন। শাহজাহান মন্‌সবদারী-প্রথা পুনর্গঠন করে আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মগুলি কিছু পরিমাণে পরিবর্তন করেন। এই সময় একশো সওয়ার-পদের মন্‌সবদারদের পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ অশ্বারোহী ও সমসংখ্যক অশ্ব পোষণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। শাহজাহানের রাজত্বের ২১তম বছরে এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যার পরিবর্তে এক-পঞ্চমাংশ সংখ্যা প্রবর্তন করা হয় এবং এই নিয়ম ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।*

আকবরের পরবর্তীকালে মন্‌সবদারী-প্রথার পরিবর্তন

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 'দাঘ' ও 'চিহ্নিতকরণ' প্রথা নির্দিষ্টভাবে প্রণালীবদ্ধ করা হয়। 'দাঘ' পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছ থেকে বছরে দুবার সার্টিফিকেট নিতে 'নগদি' মন্‌সবদারদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে মন্‌সবদারকে দুমাস অতিরিক্ত সময় দেওয়া হত। তৎসত্ত্বেও মন্‌সবদার সার্টিফিকেট নিতে ব্যর্থ হলে আট মাসের অনূর্ধ বেতন থেকে বঞ্চিত করা হত। রাজত্বের ২৩তম বছরে ঔরঙ্গজেব এক ফরমান জারি করে নগদি ও জায়গির ভোগী মন্‌সবদারদের যথাক্রমে প্রতি তিন মাস ও ছয় মাস অন্তর নিজ নিজ সেনাবাহিনীর পরিদর্শনের সময় ধার্য করা হয়।

অধ্যাপিকা শিরিণ মুসভি দেখিয়েছেন যে মাত্র ১৫৭১ জন মন্‌সবদার ৮২ শতাংশ রাজস্বের আয় ভোগ করত। এদের মধ্যে ১২ জন শতকরা ১৮ ভাগ রাজস্বের মালিকানা পায়। এভাবে মন্‌সবদারী ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের আয় হ্রাস পাওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা চলে যে, মন্‌সবদারী ব্যবস্থা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ। এর ফলে ইওরোপের মতো ভারতে জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটতে পারে নি। অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের মতে মন্‌সবদারী ব্যবস্থার ফলে বহুজাতি-ধর্ম অধ্যুষিত ভারতে আঞ্চলিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। তবে মন্‌সবদারী ব্যবস্থার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল স্ববিরোধী, কারণ এর ফলে একদিকে যেমন মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও উপযোগিতা সুনিশ্চিত হয়েছিল, অন্যদিকে পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার ক্রমিক শিথিলতা মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙ্গনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

Scanned by CamScanner